



অদ্বৈত বেদান্তে অজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা: একটি পর্যালোচনা

প্রসেনজিৎ গায়েন

সহকারী অধ্যাপক, কালিনগর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

মায়াবাদ-রূপ অন্যতম স্তরের উপর অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। অঘটন-ঘটনপটীয়সী যে শক্তি ব্রহ্মকে আবৃত করে তার উপর জগৎপ্রপঞ্চকে আরোপ করে অদ্বৈতবেদান্তে তারই নাম অজ্ঞান বা মায়া বা অবিদ্যা। মায়া নিজের ক্রিয়া ব্রহ্মে আরোপ করে বলে তা ব্রহ্মের উপাধি বলে গণ্য। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম হলেন অদ্বয়, নির্গুণ, নির্বিশেষ বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ পারমার্থিক সত্তা। জীব এরূপ ব্রহ্মের সাথে স্বরূপত অভিন্ন। কিন্তু অজ্ঞানবশত জীব তার এই ব্রহ্মস্বরূপতা হারিয়ে ফেলে। অজ্ঞান বা মায়া তার আবরণ শক্তির দ্বারা ব্রহ্মকে আবৃত করে এবং বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা ওই ব্রহ্মস্থলে মিথ্যা জগতের বিক্ষেপ ঘটায়। রজ্জু-সর্প ভ্রমস্থলে সত্য রজ্জুর উপর মিথ্যা সর্প যেমন অধ্যস্ত হয় বলে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তেমনি মিথ্যা জগতও সত্য ব্রহ্মের উপর অধ্যস্ত হয় বলে জগত ভ্রম হয়। প্রকৃতপক্ষে এই মায়া বা অবিদ্যাসৃষ্ট জগত সত্য নয়। বদ্ধজীবের কাছে জগত আছে, কিন্তু, ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে মায়াময়জগত নেই- আছে কেবলই নির্গুণ অসঙ্গ ব্রহ্ম।

১. ভূমিকা

বৈদিক চিন্তাধারার পরিপূর্ণ বিকাশ বা চরম পরিনতি উপনিষদের মধ্যে নিহিত বলে উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়। বেদান্ত দাবি করে যে এটির মূল তত্ত্ব সমস্ত ধর্ম মতের মধ্যেই নিহিত। তত্ত্বটি হল এই যে, মানুষ ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন। মানব প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু মঙ্গলময়, যা কিছু ঐশ্বর্যবান, সে সবই ওই ব্রহ্মসত্তা বা শুদ্ধ চৈতন্য থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে মানুষে মানুষে কোনও প্রভেদ নেই, কেননা সকলেই সমভাবে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন, এ যেন এক অনন্ত মহাসমুদ্র যেখান থেকে আমরা সকলে একটি তরঙ্গরূপে উদ্ভূত হয়েছি। আর এই মহাসমুদ্র হল সৎ-চিত্ত ও আনন্দময় অদ্বয় ব্রহ্ম। উপনিষদীয় চিন্তায় আত্মা বা ব্রহ্মই হল পরমতত্ত্ব বা চরমসত্য (একমাত্র সত্য)। এই আত্মা জন্ম রহিত, মৃত্যুরহিত, কোন শস্ত্র দ্বারা তাকে ছেদন করা যায় না, অগ্নি দ্বারা তা দগ্ধ হয় না, জলও তাকে দ্রবীভূত করতে অক্ষম, এই আত্মা সর্বব্যাপী, অবিনাশী। এইরূপ আত্মসাক্ষাতকারই জীবের মুক্তির একমাত্র পথ। কেননা প্রতিটি জীবই এই সর্বব্যাপী আত্মাস্বরূপ।

উপনিষদীয় ভাবধারার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হল অদ্বৈত বেদান্তী আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা শঙ্করাচার্যের জন্যই। শঙ্কর বিরচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যই প্রধান। এক ও অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্মের আত্যন্তিক সত্তা, জগতের মিথ্যাত্ব, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব এবং মুক্তিতে জীবের ব্রহ্ম স্বরূপতা উপলব্ধি প্রভৃতির স্বীকৃতি এবং একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস অদ্বৈতবেদান্তের মূল বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের সম্যক জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছে মায়া নামক এক ভ্রম সৃষ্টিকারী শক্তি। শঙ্করের মতে মায়া উপহিত ব্রহ্ম (ঈশ্বর) জগত রূপে প্রকাশিত হন। আর বদ্ধ জীব তার অবিদ্যাবশত এক ব্রহ্মের পরিবর্তে জগতের নানাত্বকে সত্য

রূপে দেখে। শঙ্কর মায়াকে “অবিদ্যা” বা “অজ্ঞান” বলেও অভিহিত করেছেন। ঈশ্বরের দিক থেকে যা মায়া জীবের দিক থেকে তাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। তাই শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্ব বা একমাত্র সত্য উপলব্ধির নিমিত্ত অজ্ঞানের ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজনার্থেই আমার এই নিবন্ধটি নিয়োজিত। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই অদ্বৈতবেদান্তের মূল কথা ও তার তাৎপর্য সংক্ষেপে বোঝা দরকার। অতঃপর ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধে, মিথ্যা জগতের প্রকৃতি, মায়ার স্বরূপ ও ক্রিয়াকলাপ বোধগম্যতার মধ্য দিয়ে অবগত হতে হবে যে অদ্বৈতবাদে বর্ণিত একমাত্র সত্যের উপলব্ধি বা অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধি মায়াবাদের সম্যক জ্ঞান ব্যতিরেকে কল্পনা করা যায় না। কাজেই অদ্বৈতবাদ নির্দেশিত মূল সত্য বোধগম্যতার সাপেক্ষে অজ্ঞানের আলোচনা কতটা প্রাসঙ্গিক তা এজাতীয় আলোচনার মধ্যেই সন্ধান করতে হবে।

২. অদ্বৈতবেদান্তের মূল বক্তব্য

শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্যকে যে শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন তা হল:

“শ্লোকার্থেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।”

তাৎপর্য হল, যে সত্য প্রতিপাদনে কোটি কোটি গ্রন্থ ব্যস্ত তা একটি শ্লোকেই প্রকাশ করা হচ্ছে - ‘ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম, জগৎ ও জীবের স্বরূপ ব্যাখ্যা ও ততসহ জীব(জীবাত্মা) ও ব্রহ্মের (পরমাত্মা) অভেদ জ্ঞান প্রতিপাদন অদ্বৈতবেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য এবং এই দর্শনের প্রয়োজন হল শাস্ত্রত মুক্তি বা ব্রহ্মোপলব্ধি যা অবিদ্যার সমূলনিবৃত্তির মধ্য দিয়েই অর্জিত হতে পারে।

৩. ব্রহ্মের স্বরূপ

অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম হল অদ্বয়, নির্বিশেষ, নিরাকার, নিরাবয়ব, নির্গুণ, সর্বব্যাপক, অসীম, স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশক ও বিশুদ্ধচৈতন্য। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সৎ, চিৎ ও আনন্দ হওয়ায় তা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই লক্ষণটি ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশক বলে এটি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ কখনোই ব্রহ্মের গুণ নয়। সৎ বলতে ব্রহ্মে অসত্তা নিষিদ্ধ হয়েছে। ব্রহ্মের স্বরূপই হল তা সনাতন সত্তা, তিনি কখনোই অসৎ হতে পারেন না। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বা চৈতন্যস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মে জ্ঞানাভাব নেই বা তিনি অচিৎ বা জড় নন এইরূপ বোঝাতে ব্রহ্মকে চিৎস্বরূপ বলা হয়েছে। আবার ব্রহ্ম সদা আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দাভাব বা দুঃখস্বরূপ নন বলে তিনি আনন্দস্বরূপ।

আবার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বলা হয়েছে: “জন্মাদ্যস্যযতঃ” অর্থাৎ জগতের জন্ম হয়েছে যা থেকে, যেখানে জগৎ অবস্থান করে এবং যেখানে জগতের লয় হয় তাই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ‘জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক হল ব্রহ্ম’—এটি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। কেননা লক্ষণটি লক্ষ্য (ব্রহ্ম) যতকাল থাকে ততকাল লক্ষ্য না থেকে ও লক্ষ্যকে অলক্ষ্য থেকে পৃথক করে। এই লক্ষণ কখনোই লক্ষ্যের স্বরূপের পরিচায়ক নয়। প্রকৃত বিচারে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় হওয়ায় জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক হতে পারেন না। বস্তুত, এই জাতীয় ব্রহ্ম (স্রষ্টা, রক্ষক, সংহারক) মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম, শুদ্ধ ব্রহ্ম নয়, শুদ্ধ ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।

৪. সত্ত্বত্রৈবিধ্যবাদ

অদ্বৈতবাদে সত্ত্বকে ‘একমেবদ্বিতীয়ম্’ অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় বলা হয়েছে। এই সত্ত্বই ব্রহ্ম এবং তা পারমার্থিক সৎ। শঙ্করাচার্য তিনপ্রকার সত্ত্বের কথা বলেছেন—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক

সত্তা। যে সত্তার বাধ বা নিষেধ কালত্রয়ে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) সম্ভব নয় তা পারমার্থিক । ব্রহ্ম কোন কালেই বাধিত হন না বলে তিনি পারমার্থিক সৎ । আমাদের প্রমার বিষয়গুলি যথা জগৎ, ঈশ্বর, জীব প্রভৃতি ব্যবহারকালে অবাধিত এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে এগুলি বাধিত হয়ে যায় বলে এগুলির ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃত। আবার ভ্রমজ্ঞানের বিষয় হল প্রাতিভাসিক সত্তা। কেননা প্রতীতিকালে এগুলি অবাধিত এবং এদের বাধের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের আবশ্যক হয় না । বরং যেকোনো বিরোধী জ্ঞানের দ্বারাই এদের বাধ সম্ভব । যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রমজ্ঞান হলে সেই জ্ঞান বিরোধীজ্ঞান যথা- রজ্জুর জ্ঞানের দ্বারাই বাধিত হয় । শঙ্করের মতে ব্যবহারিক সত্তাসম্পন্ন ঈশ্বর হলেন নামরূপাদি বিকার, ভেদউপাধি বিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্ম (অপর ব্রহ্ম) আর পারমার্থিক সত্তাসম্পন্ন ব্রহ্মই হলেন নির্গুণ ব্রহ্ম (পর ব্রহ্ম) যিনিই একমাত্র প্রকৃত সত্তা ও সত্য ।

৫. ব্রহ্ম সমস্ত প্রকার ভেদরহিত, নির্গুণ ও নির্বিশেষ

শঙ্করের মতে অভেদ সত্য, ভেদ মিথ্যা; এক সত্য, বহু মিথ্যা, অদ্বৈত সত্য, দ্বৈত মিথ্যা। তাই একমাত্র সৎ চৈতন্য স্বরূপ নির্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্ম সর্বভেদ বর্জিত । স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদের কোনোটিই ব্রহ্মে নেই । সমজাতীয় দুটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান ভেদ হল স্বজাতীয় ভেদ । অদ্বয় ব্রহ্মের সমজাতীয় কিছু নেই বলে ব্রহ্ম স্বজাতীয় ভেদ বর্জিত । দুটি বিষম জাতীয় বস্তুর /ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান ভেদ হল বিজাতীয় ভেদ । যেমন মানুষের সাথে গরুর ভেদ । যা অদ্বয় তার বিজাতীয়ও কিছু থাকে না বলে ব্রহ্মে এইজাতীয় ভেদও নেই । আবার একই ব্যক্তি বা বস্তুর অন্তর্গত বিভিন্ন অবয়বের মধ্যে যে ভেদ তা হল স্বগত ভেদ, যথা- মানব শরীরস্থ হাত, পা, উদর প্রভৃতি ভেদ। অদ্বয় ব্রহ্ম নিরাবয়ব হওয়ায় তার বিভিন্ন অবয়বের মধ্যে ভেদের প্রশ্নই আসে না ।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম নির্গুণ। কারন কোন বিষয়ে গুণ আরোপিত হলে বিষয়টিকে সীমিত বলতে হয়, কিন্তু ব্রহ্ম তো অসীম, সর্বব্যাপী, আবার যা সবিশেষ তার একটা বিশেষণ অবশ্যই থাকে। যেমন টেবিলের বিশেষণ হল বাদামী রঙ এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ্য টেবিল এবং বিশেষণ বাদামী রঙের মধ্যে ভেদরেখা কল্পিত হয়। তাছাড়া এরূপ ক্ষেত্রে বাদামী ও অবাদামী এই দুটি ভিন্ন জগৎ পরস্পরকে সীমিত করে। কিন্তু ব্রহ্ম সকল প্রকার ভেদরহিত ও অসীম হওয়ায় নির্বিশেষ।

৬. জগতের ধারণা

শঙ্করাচার্য জগতকে ব্রহ্মের বিবর্ত বলেছেন। মায়ার দ্বারা উপহিত ব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্ম /ঈশ্বর) জগতরূপ বিবর্তের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ।আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয় যুক্ত অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত চৈতন্য(ঈশ্বর) চৈতন্য প্রধানরূপে জগতের নিমিত্ত কারণ হন এবং শরীরপ্রধানরূপে উপাদান কারণ হন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগত হল ঈশ্বরের কার্য, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগত মিথ্যা। কারণ ব্রহ্মরূপ একমাত্র সৎ অধিষ্ঠানে জগত কোনকালেই ছিল না, থাকবেও না। অজ্ঞানতা হেতু রজ্জু যেমন সর্পরূপে প্রতিভাত হয়,কখনোই সর্পে পরিণত হয় না, ঠিক তেমনই অনাদি অবিদ্যা বা অজ্ঞান হেতু অদ্বয় ব্রহ্ম বিচিত্র জগতরূপে প্রতিভাত হন, কখনোই জগতে পরিণত হন না।

৭. জগৎ কোন অর্থে মিথ্যা?

এবার দেখা যাক জগতকে মিথ্যা বলার তাৎপর্য কী! জগতের মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যার নিমিত্ত শঙ্কর পরিণামবাদ প্রত্যাক্যান করে বিবর্তবাদ গ্রহণ করেছেন। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ সত্য সত্যই

কার্যরূপে পরিণত হয়। যেমন তিল তেলে পরিণত হয়। সাংখ্য দর্শন এই মতবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু বিবর্তবাদানুসারে কারণ বাস্তবিকই কার্যে পরিণত হয় না। কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। অর্থাৎ কার্য হল কারণের বিবর্ত। যেমন ভ্রমজ্ঞানে রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, সর্পে প্রকৃতই যে পরিণত হয় না তা রজ্জুজ্ঞানের দ্বারাই বোঝা যায়। তাই সর্প হল রজ্জুর বিবর্ত। অনুরূপ ভাবে জগৎ হল ব্রহ্মের বিবর্ত, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতরূপে প্রকৃতই পরিণত হন না। বরং জগতরূপে প্রতিভাত হন মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগতের জ্ঞান বাধিত হয়ে যায় বা তখন আর জগতের জ্ঞান থাকে না। তাই জগৎ মিথ্যা। কেননা যা অবাধিত নয় তা মিথ্যা এবং যা অবাধিত তা সর্বদা সর্বত্র বিরাজিত এবং কেবল তাই সত্য, তাই পরমতত্ত্ব যথা- ব্রহ্ম।

অদ্বৈত বেদান্তে মিথ্যার অন্য একটি লক্ষণে বলা হয়েছে সৎ, অসৎ ভিন্ন যা (সদসদ্বিলক্ষণ) অর্থাৎ অনির্বচনীয় তাই মিথ্যা। জগৎ সৎ নয়, কেননা তা বাধিত হয়। আবার অসৎ বা অলীক ও নয়, কেননা অসৎ বস্তুর প্রকৃতিই হল তা নিঃস্বভাব অর্থাৎ তা ভাবরূপে কখনোই জ্ঞানে প্রতীয়মান হয় না, যেমন- আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি। কিন্তু জগৎ একরূপ নয়। জগৎ প্রমা/ সাধারণ অনুভবের বিষয় হওয়ায় জ্ঞাতা মাত্রেরই ঘট, পট প্রভৃতি জাগতিক বিষয় প্রত্যক্ষ হয়।

৮. জীব ও ব্রহ্ম

এখন অতিঅবশ্যই এবিষয়ে অবগত হতে হবে যে, অদ্বৈত বেদান্তে জীবের ধারণা এবং জীবের সাথে ব্রহ্মের সম্বন্ধ কীভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অন্যথায় অদ্বৈত বেদান্তের মূল বক্তব্য অধরা থেকে যাবে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের পৃথক কোন সত্তা নেই। এখন প্রশ্ন হল, ব্রহ্ম তো অদ্বয়, সেক্ষেত্রে জীব যদি ব্রহ্মস্বরূপ হয় তবে বিভিন্ন জীবে ভেদজ্ঞান হয় কেন? শঙ্কর বলেন, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের মতই চৈতন্যস্বরূপ। অনাদি অজ্ঞান বা অবিদ্যা বশতঃ জীব নিজের ব্রহ্মস্বরূপতা হারিয়ে ফেলে এবং নিজেকে দেহের সাথে অভিন্ন বলে মনে করে। সুতরাং অজ্ঞান প্রসূত দেহ, অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) প্রভৃতি উপাধিযুক্ত আত্মাই জীব রূপে প্রকাশিত হয়। এমতাবস্থায় অন্তঃকরণ ও সসীম শরীরের সঙ্গে জীবের ভিন্নতার জ্ঞান থাকে না। ফলে জীব নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা রূপে দাবী করে। এই হল অহংরূপী জীব যা কখনোই শুদ্ধ আত্মা নয়। সুতরাং অনাদি অবিদ্যার কারণে দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রভৃতির দ্বারা বদ্ধ ও সীমিত আত্মাই জীব বলে প্রতিভাত হয়। জীব ও ব্রহ্মের এইজাতীয় ভেদকে শঙ্কর ব্যবহারিক বলেছেন। প্রকৃত সত্যের জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) উদয় হলে এইরূপ ভেদ তিরোহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে শঙ্করাচার্যের দর্শনে ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র রূপে জীবাত্মার কোন অস্তিত্বই স্বীকৃত হয়নি।

৯. মায়া/ অজ্ঞানের স্বরূপ ও প্রভাব

উপরিউক্ত আলোচনায় জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে অবিদ্যা বা অজ্ঞান শব্দদুটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে যে, অবিদ্যা / অজ্ঞান কী বস্তু? এটি কোথা থেকে এসেছে? এর ক্রিয়াকলাপই বা কী? উত্তর হল অদ্বৈত বেদান্তে মায়ার সমর্থক হিসেবে উক্ত শব্দদ্বয়ের ব্যবহার দেখা যায়। তাহলে প্রশ্ন হবে মায়া কী?

বস্তুত বেদান্ত দর্শনের অন্যতম ভিত্তিস্তম্ব হল মায়াবাদ। কারণ 'মায়া'র ভূমিকা/ তাৎপর্য না বুঝলে বেদান্ত দর্শন প্রদর্শিত সত্যপোলন্ধি অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে। এই জগৎ সংসারে প্রতিটি ঘটনার মধ্যে সর্বত্রই বিরুদ্ধভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন আজ যা মঙ্গলরূপে দেখা দিচ্ছে আগামীতে তাই অমঙ্গলের হেতু হচ্ছে; আজ যা স্বপ্ন, কাল সেটাই দুঃসপ্নের কারণ হয়ে ওঠে; যেখানেই জীবন সেখানেই মৃত্যু ছায়ার

মতো তাকে অনুসরণ করে চলেছে ; নিজেকে যা সুখী করছে অন্যকে সেটাই দুঃখী করছে-----এই বিরুদ্ধ অবস্থা সমূহের প্রতিকার আমরা পাই না । মৃত্যুকে না চাওয়া যদি আমার কাঙ্ক্ষিত হয় , তবে জন্মের প্রত্যাশাকেও বারণ করতে হবে ; দুঃখ যদি কাম্য না হয় , তবে সুখকেও কামনা করা যাবে না ।মৃত্যুহীন জীবন, দুঃখহীন সুখ স্ববিরোধী -----কোনটিকেই একান্তে পাওয়া যায়না। ----- এমন সব ভয়ঙ্কর বিরোধের মধ্য দিয়েই তৈরী হয়েছে আমাদের যাত্রাপথ , যে পথের মধ্য দিয়েই সংসারে আসা যাওয়া । এইরূপে সংসারগতির বর্ণনার নামই মায়া।

ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, শক্তি, অহংকার, ভোগবাসনা এসবেরই চরম পরিণতি মৃত্যু। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, আমাদের উন্নতি, ভোগ- বিলাসীতা, ব্যর্থ আড়ম্বরপূর্ণ জীবনধারা সবেরই সমাপ্তি মৃত্যুতে বা বিনাশে। সাধু মরছে, পাপী মরছে, রাজা মরছে, প্রজা মরছে, ধনী মরছে, ভিক্ষুকও মরছে ----- সকলেই মৃত্যুর অভিমুখে ধাবমান । তা সত্ত্বেও বিষম আসক্তি বর্জন করা কারুর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না! কিন্তু কেন? কেন আমরা জীবনের অনিবার্য সত্যরূপ মৃত্যুর কথা মাথায় না রেখে সুখ-দুঃখের জনক জাগতিক ভোগ্য সামগ্রীকে শুধুই সুখের উৎপাদক ভেবে তাদের প্রতি আসক্ত হই! কেনই বা ভাবি না আজ যেটা আমার গতদিনে সেটা অন্যের ছিল, আগামীতে তা আবার অন্য কারুর হয়ে যাবে! ----- এটাই মায়া । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যক্ষরাজ কর্তৃক সম্রাট যুধিষ্ঠিরের নিকট এই পৃথিবীর সবথেকে আশ্চর্যের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উত্তরে সম্রাট বলেছিলেন, 'প্রতিনিয়তই বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের মৃত্যু ঘটে চলেছে, অথচ যারা জীবিত তাদের একবারের জন্যও মনে হয় না, তারা ও চিরকাল জীবিত থাকবে না '----- এটাই সর্বপেক্ষা আশ্চর্য। সত্যিই! আমাদের আচরণ, ব্যবহার, ভাবনা, চিন্তন যেমনভাবে সংসারে প্রকাশিত হয়ে চলেছে তা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অন্তরের জ্যোতির্ময় আলোকের স্পর্শে অনুধাবন করলে সকলের মধ্যে এই ভাবাবেগেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মৃত্যু যেন আমাদের জীবনকে কখনোই স্পর্শ করতে পারবে না! ----- এটাই মায়া যা সত্যের চোখে পট্টি বেঁধে দিয়েছে।

মায়াকে বুঝবার প্রয়াস হিসেবে উপরিউক্ত আলোচনার সাপেক্ষে অন্ততঃপক্ষে এটুকু উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, মায়া যেন এক মায়াবী শক্তিরূপে কাজ করে চলেছে যা সত্যকে বোঝার, উপলব্ধি করার পথে প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান, অজ্ঞজীব যেটাকে অতিক্রম করতে পারছে না। যাদুকের যেমন তার ছলচাতুরী দ্বারা মিথ্যাবস্তু তৈরী করে এবং আমরা অজ্ঞ দর্শকবৃন্দ তাতে বিম্মিত হয়ে মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করি, এই মায়াশক্তি তেমনই মিথ্যাবস্তুকে সত্য বলে ভাবতে বাধ্য করে।

শঙ্করাচার্য মায়াকে এক ভ্রম উৎপাদনকারী শক্তি বলেছেন যে শক্তি সত্যকে (ব্রহ্ম) আবৃত করে এবং মিথ্যাকে (জগত প্রপঞ্চ) সেই সত্যের উপর আরোপ করে। ফলতঃ মিথ্যা জগৎ প্রপঞ্চকে আমরা সত্যরূপে বোধ করি, আর প্রকৃত সত্য মিথ্যার আস্তরণে ঢাকাই থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর মায়ারূপ শক্তির দুটি ক্রিয়ার কথা বলেছেন – আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ শক্তির কাজ হল পারমার্থিক সৎ ব্রহ্মের স্বরূপের প্রকাশকে রুদ্ধ করে রাখা। আর বিক্ষেপ শক্তির কাজ হল সত্যের প্রকাশের রুদ্ধদ্বারে মিথ্যাকে প্রকাশ করা। কাজেই অবিদ্যা /মায়া বিক্ষেপের দ্বারা ব্রহ্মের স্থলে মিথ্যা জগতকে আরোপ করে। অর্থাৎ মায়া তার আবরণ শক্তির দ্বারা প্রথমেই সত্যকে আবৃত করে, পরে বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা সত্যের অধিষ্ঠানে মিথ্যার আরোপ করে। এইরূপে মায়ার দ্বারা সত্য ব্রহ্মে মিথ্যা জগৎ আরোপিত হওয়াতে মিথ্যা জগত আমাদের নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। এজন্যই জগৎ হল ব্রহ্মের বিবর্ত। রজ্জু-সর্প ভ্রমস্থলে সত্য রজ্জুর উপর মিথ্যা সর্প যেমন অধ্যস্ত হয় বলে সর্পভ্রম হয়, মিথ্যা জগৎও তেমনি সত্য ব্রহ্মের উপর

অধ্যস্ত হয় বলে জগৎ ভ্রম হয়। কাজেই লক্ষণীয় এই অজ্ঞান বা মায়াই এই সকল ভ্রমের কারণ। এই মায়ার কারনেই যা নেই তাকে আছে বলে মনে হয়; যা মিথ্যা তাকে সত্য বলে মনে হয়।

উক্তরূপে মায়ী নিজের ক্রিয়াকে ব্রহ্মে আরোপ করায় ব্রহ্মের উপাধিও বলা হয়ে থাকে মায়াকে। লালবর্ণের জবাকুসুম যেমন সমীপস্থ কাঁচের উপর নিজস্ব লাল রঙকে আরোপ করায় স্বচ্ছ সাদা কাঁচটির স্বরূপ যেমন লাল বর্ণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তেমনি মায়ারূপ উপাধি সমীপস্থ ব্রহ্মের উপর নিজস্ব গুণ আরোপ করায় ব্রহ্মস্বরূপতা মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং অদ্বৈত বেদান্তে সৃষ্টি বলতে আরোপকে বোঝায়।

শঙ্করাচর্য মায়ী বা অবিদ্যার যে রূপ স্বরূপের কথা বলেছেন তা সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত মায়ার লক্ষণের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। লক্ষণটি হলঃ

“অজ্ঞানন্তু সদ- অসদ্যাম্ অনির্বচনীয়ম্ ত্রিগুণাত্মকম্
জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপম্ যদ্বিকল্পিতম্।”

তাৎপর্য হল মায়াকে সৎ বা অসৎ কোনটাই বলা যায় না। মায়ী সৎ নয়, কেননা সৎ হবে কেবল তাই যা ত্রিকাল অব্যাহিত। সৎ ব্রহ্মের জ্ঞান হলেই মায়ার জ্ঞান বাধিত হয়ে যায়। আবার মায়াকে অসৎ ও বলা যায় না, কেননা আকাশকুসুম, বক্ষ্যাপুত্র প্রভৃতি অসৎ বস্তু কখনোই জ্ঞানের বিষয় হয় না কিন্তু অজ্ঞানের বিষয় প্রত্যক্ষীভূত ঘটনা, যথা রজ্জুতে সর্পভ্রম। তাই অজ্ঞান/মায়ী হল সদ-অসদ্যাম্ বা সদসদবিলক্ষণ অর্থাৎ অনির্বচনীয়। আর যা অনির্বচনীয় তা মিথ্যা, যেমন- জগৎ। এই মায়ী সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের শক্তিরূপে জগৎ সৃষ্টির কারণ।

অদ্বৈতমতে অবিদ্যাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বিদ্যমান। ফলে অবিদ্যা/অজ্ঞান সৃষ্ট জগৎ ও জাগতিক যাবতীয় পদার্থেই এই তিনপ্রকার গুণের উপস্থিতি। তবে অদ্বৈতবেদান্তে এই ত্রিগুণাত্মক মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়।

মায়াকে জ্ঞানবিরোধীও বলা হয়েছে। মায়ী উপহিত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মায়ী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই মিথ্যা বিচিত্র জগৎ রচিত হয়েছে। আর বদ্ধ জীব অজ্ঞান বশত এই মায়ীসৃষ্ট মিথ্যা জগতকেই সত্য বলে মনে করে চলেছে। সুতরাং মায়ী জীবের কাছে প্রকৃত সত্যের উদয় হতে দিচ্ছে না, প্রকৃত সত্যকে আবৃত করে সেস্থলে মিথ্যাকে প্রকাশ করে চলেছে। কাজেই তা জ্ঞান বিরোধী।

মায়ী আবার ‘ভাবরূপম্’ ও বটে। অর্থাৎ তা কেবল অভাবকে সূচিত করে না, ভাবকেও সূচিত করে। আবরণ শক্তির দ্বারা সৎ অধিষ্ঠানকে (ব্রহ্ম) আবৃত করাটা মায়ার অভাবাত্মক অবস্থা। আবার বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা সত্যস্থলে মিথ্যা জগতের আরোপ বা বিক্ষেপ হয়। এটাই মায়ার ভাবাত্মক অবস্থা। তবে মায়ী ব্রহ্মের ন্যায় ভাব পদার্থ নয়। কেননা সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের বিনাশ কখনোই সম্ভব হত না। কিন্তু পারমার্থিক ভাব পদার্থ ব্রহ্মের জ্ঞান হলে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়।

‘যৎকিঞ্চিৎ’ বিশেষণের দ্বারা মায়ী যে অলীক নয় বা তা যে নিছক শূন্যতা নয়, তা কিছু একটা সেকথাই বোঝানো হয়েছে। কেননা মায়ী মিথ্যা, আর মিথ্যা বলতে যে শূন্যতা বোঝায় না তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। কাজেই শঙ্কর মায়াময় জগত প্রপঞ্চের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য 'যদুর্কিঞ্চিদিতি' শব্দস্থ 'ইতি' অর্থে ইত্যাদি বোঝানো হওয়ায় বুঝতে হবে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া ও মায়ার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি নিম্নরূপঃ

মিথ্যা জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তির কোন ক্ষণ বলা যায় না অর্থাৎ তা অনাদি। ফলে জগতের কারণ অজ্ঞান ও অনাদি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ সম্ভব বলে তা অনন্ত নয়। অজ্ঞানের নাশে অজ্ঞান দ্বারা আরোপিত মিথ্যা জগতের জ্ঞান ও আর থাকে না।

অজ্ঞান বা মায়া আবার অবলম্বনহীন হয়ে থাকতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন হবে মায়ার আশ্রয় বা অবলম্বন কী? অলীক/অসৎ বস্তু কোন কিছুর আশ্রয় হতে পারে না, কেননা যা নিজেই জ্ঞানের বিষয় নয় তার পক্ষে অন্য কিছুর অবলম্বন হওয়া অসম্ভব। কাজেই সৎ কোন কিছুকেই মায়ার আশ্রয় হতে হবে। আর ব্রহ্মই একমাত্র সৎ হওয়ায় তাকেই মায়ার আশ্রয় বলা হয়েছে। সংশয় হতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি মায়ার আশ্রয় হয় তবে ব্রহ্ম কি করে মায়া স্বরূপ না হয়ে মায়া থেকে ভিন্ন হবে !

এইরূপ সংশয় নিরসনের জন্য অদ্বৈতবেদান্তে বলা হয়েছে, যাদুকরের যাদু শক্তির দ্বারা যেমন শুধু অজ্ঞ দর্শকবৃন্দ প্রতারিত হলেও যাদুকর নিজে প্রতারিত হন না, আকাশে আরোপিত নানা বর্ণ যেমন আকাশকে স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি অজ্ঞান ব্রহ্মে আশ্রিত হলেও তা ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারেনা। অর্থাৎ মায়াশক্তির দ্বারা অপরিণামী ব্রহ্মের কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। যাদুকরের মায়াজালে যেমন দর্শকবৃন্দ প্রতারিত হয়ে একটি বস্তুর জায়গায় বহুবস্তুকে সত্য বলে মনে করে, তেমনি মায়ার দ্বারা প্রতারিত হয়ে বদ্ধজীব এক এবং কেবলমাত্র একটি সত্যের (ব্রহ্ম) স্থলে বহু জাগতিক মিথ্যাকে সত্য মনে করে।

কাজেই যতক্ষণ মায়ার প্রভাব থাকে ততক্ষণ মিথ্যা জগৎ সত্যরূপে প্রকাশিত থাকে। আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মজ্ঞান হলেই মায়ারূপ মিথ্যাজ্ঞান ও সেই সাথে মিথ্যা জগতের জ্ঞান মরীচিকার মতো বিলীন হয়ে যায়। আর আত্মসাক্ষাৎকারই মোক্ষ বা মুক্তি। আত্মসাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মুক্তি বলতে কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মার নতুন প্রাপ্তি বোঝায় না, কেননা জীব তো নিত্যমুক্ত, সে আত্মস্বরূপ। তাই আমরা আত্মাকে পেয়েই বসে আছি, তাকে নতুন করে পাওয়ার প্রশ্নই নেই। কেবল তার উপর যে ময়লার আস্তরণ পড়েছে তা পরিষ্কার করে তাকে দর্শন করতে হবে। আর এই আবর্জনাটাই অজ্ঞান। এটাই সত্য দর্শনের পথে মূল প্রতিবন্ধক। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব এবং জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধি অজ্ঞানের নাশ ব্যতিরেকে অসম্ভব। এখানেই অজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা।

১০. উপসংহার

বেদান্তে নির্ভীকভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, 'আমরা যদি মনে করি আমরা বদ্ধ তবে আমরা বদ্ধই থেকে যাবো।' কাজেই আমাদেরকে এই অনুভূতির অধিকারী হতে হবে যে, আমরা সর্বদাই মুক্ত ছিলাম, মুক্তই আছি, চিরদিনই মুক্তই থেকে যাবো, আমাদের কোন পরিবর্তন নেই, নেই কোন পরিণামও, আমরা জন্মগ্রহণ করি না, করিনা মৃত্যুবরণও। কেননা আমরা (জীব) চিরমুক্ত পারমার্থিক সৎ ব্রহ্মস্বরূপ। কাজেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হল আসলে প্রাপ্তের প্রাপ্তি। জীব বন্ধনদশায় যতদিন থাকবে ততদিন আত্মোপলব্ধি বা মুক্তি সম্ভব নয়। আর তার জন্য প্রয়োজন হয় বন্ধনের কারণ অজ্ঞানের

তিরোধন। শঙ্কর বলেন, অজ্ঞান বা মায়ার সম্পূর্ণ বিলোপের নিমিত্ত শুদ্ধচিত্তে বেদান্ত পাঠ একান্ত প্রয়োজন।

সত্য উন্মোচনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ মায়াতত্ত্ব সম্বন্ধে আরেকটু স্বচ্ছ ধারণার জন্য নিম্নোক্ত আলোচনা দিয়েই লেখার ইতি টানছি। উপরোক্ত যাবতীয় আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হল যে, ময়া একটি আবরণ বা পর্দা স্বরূপ যার বহির্ভাগে রয়েছে প্রকৃত সত্য। এখন এই পর্দাটিতে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের কল্পনা করা যাক যার ভিতর দিয়ে বাইরের সত্যটির কিছুটা আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এখন এই ছিদ্রটি যতই বড়ো হতে থাকবে সত্যের রূপটি ততই বেশী করে দৃষ্টিগোচর হতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং পর্দাটি সম্পূর্ণ যখন থাকবে না তখন সমগ্র সত্যের প্রকৃতরূপের সাক্ষাৎ সম্ভব হবে। এমনক্ষেত্রে অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে বলতে হবে পর্দাটির অপর প্রান্তে থাকা এই প্রকৃত সত্যটিই হল আত্মা (ব্রহ্ম), পর্দাটি হল ময়া/অবিদ্যা এবং দর্শকবৃন্দ হলাম বদ্ধজীবরূপী আমরা। বস্তুতঃ এই উপমায় দর্শক (জীব) ও দৃশ্য (ব্রহ্ম) অভিন্ন। কিন্তু সেই অভিন্নতা সাক্ষাৎকারের পথে এই দুইয়ের মধ্যে প্রাচীর হয়ে দণ্ডায়মান পর্দারূপী অবিদ্যা বা ময়া।

সুতরাং আমাদের সমস্ত সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে ঐ ময়ারূপী পর্দার ছিদ্রটিকে ক্রমশ বৃহৎ করতে করতে অবশেষে পর্দাটিকে ছিন্ন করা। তবেই তো প্রকৃত সত্যের সাক্ষাৎকার সম্ভব। অর্থাৎ আমাদের কাজ আত্মাকে বা নিজেকে মুক্ত করা নয়, কেননা আত্মা (জীব) তো স্বতঃই মুক্ত। বরং আমাদের কাজ হবে নিজেদেরকে বন্ধন মুক্ত করা অর্থাৎ পর্দারূপ ময়াজাল ছিন্ন করা। অন্যভাবে বলা যায়, সূর্য কখনো কখনো মেঘের দ্বারা ঢেকে থাকার কারণে পৃথিবীতে আলোর মাত্রা হ্রাস পায়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সূর্যের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। কেননা মেঘগুলি যতই বায়ুর সাহায্যে সরে যেতে থাকবে সূর্যালোক ততই প্রকট হতে থাকবে। আর মেঘগুলি সূর্যের উপর থেকে যখন সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হবে তখন সূর্যকে তার সমগ্র জ্যোতি প্রকাশের মাধ্যমে স্বসরূপে দেখা যাবে। আমাদের কাজ হবে সূর্যরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের জন্য মেঘরূপ ময়াকে সমূলে নিবারণ করা। আর সেজন্য বায়ুর সাহায্যে নিতে হবে। এক্ষেত্রে শুদ্ধচিত্তে বেদান্ত অধ্যয়নই হবে বায়ুর নামান্তর।

সবশেষে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ভাবরূপে প্রতিভাত বা ব্যবহারিক সৎ মিথ্যা জগৎকে যথাযথ ব্যাখ্যার জন্য এবং একইসাথে পারমার্থিক সৎ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধিসহ জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ ও জীবের মুক্তি সম্পর্কে যথাযথ অবগতির নিমিত্ত মায়াতত্ত্বের/অজ্ঞানতত্ত্বের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা অনস্বীকার্য।

১১. সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. লোকনাথ চক্রবর্তী, সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসারঃ, লোকনাথ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জানুয়ারি, ২০১১।
২. স্বামী চৈতনানন্দ, বেদান্তঃমুক্তির বাণী, উদ্বোধন কার্যালয়, মে, ২০১৬।
৩. ডঃ সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয় দর্শন, বুক সিভিলিটি প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট, ২০১৮।
৪. দেবব্রত সেন, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগস্ট, ২০০১।
৫. প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর, ২০১০।
৬. দীপক কুমার বাগচী, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০১৩।
৭. ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।
৮. গোবিন্দ চরণ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, মিত্রম্, জুলাই, ২০১২।